

THIRTEENTH NURUL MATIN MEMORIAL LECTURE ON
ETHICS IN BANKING
(2013)

“ব্যাংক-ব্যবস্থা ও ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা”

অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা
পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক
এবং
প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়



বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

এ. এফ. এম. নুরুল মতিন এর জীবনবৃত্তান্ত



(১৯২৮-১৯৭৮)

জনাব নুরুল মতিন ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫১ সালে তদানিন্তন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের গবেষণা বিভাগে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে তাঁর চাকুরী ঐ ব্যাংকের অপারেশন বিভাগে স্থানান্তরিত হয়। তাঁর দীর্ঘ ব্যাংকিং জীবনে তিনি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে নির্বাহী পরিচালক, ইকুইটি পার্টিসিপেশন ফান্ড এর নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর সহ বহু উর্ধ্বতন পদমর্যাদায় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিআইবিএম এর একজন প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য।

জনাব নুরুল মতিন বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তদানিন্তন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক সভায় যোগদান করেছেন। তিনি শুধু একজন দক্ষ কর্মকর্তাই ছিলেন না বরং একজন সম্মানিত ও নিষ্ঠাবান চরিত্রের লোক ছিলেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকেই বাংলাদেশের ব্যাংকিং পরিকাঠামো নির্মাণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন অর্ডার ১৯৭২ প্রণয়ণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সত্তর দশক এবং পরবর্তীতে ব্যাংকিং খাতের উন্নতির জন্য নীতি নির্ধারণী বিষয়ে তাঁর অবদান উচ্চ মহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। তিনি ১৯৭৮ সালে ব্যাংকিং খাতে তার অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। ব্যাংকিং খাতে তাঁর এই অসামান্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ব্যাংক-ব্যবস্থা ও ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা

অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা

পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক

এবং

প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যাংক-ব্যবস্থা ও ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা

এখানে কিছু বলার জন্য আপনারা যে আমাকে ডেকেছেন, এটা আমার কাছে অশেষ গৌরবের। আমি কৃতার্থ বোধ করি। এই প্রতিষ্ঠান- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট-এর গুরুত্ব এদেশে শিখরস্পর্শী; যদিও অনেকটা আড়ালে থেকে যায়। অর্থনীতি যত সচল হয়, কর্মকাণ্ডে যত বিস্তার ও গভীরতা আসে, টাকার লেনদেনে তত বৈচিত্র্য ও জটিলতা বাড়ে। ব্যাংক ব্যবস্থা সেখানে প্রায় নিঃশব্দে কেন্দ্রভূমিতে চলে আসে। এই ব্যবস্থা অবশ্য শুধুই বিহিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আটকে থাকে না। তাকে ছাড়িয়েও যায়। ঐতিহ্যের যোগসূত্রগুলো নানাদিকে ছড়ায়। তারা আবার নতুন-নতুন চিন্তা-ভাবনা, এমনকি ফন্দি-ফিকিরের পথ খুলে দেয়। ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। প্রান্ত থেকে কেন্দ্র, সব জায়গাতেই মানুষের জীবন-যাপনে তা অপরিহার্য হয়ে উঠতে থাকে। হয়ে ওঠে। তারই বিষয়-আশয় বোঝাপড়া নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কারবার। একে উপেক্ষা করা চলে না। সবাই এটা আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করবেন, এবং এর আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, এইটি আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি।

আমার এই কথা বলার সুযোগ যাকে স্মরণ করে, সেই অকাল-প্রয়াত কীর্তিমান ব্যাংকার, এ.এফ.এম. নুরুল মতিন যে নিরন্তর প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন, তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম সম্মান জানাই। তবে খুবই সংকোচের সঙ্গে স্বীকার করে নিই, তাঁর বিষয়ে আগে আমার কিছুই জানা ছিল না। মফস্বলে থাকি। যোগাযোগও ক্ষীণ। তাই নুরুল মতিনের মত স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আমার অগোচরে থেকে যান। এ ব্যর্থতা সবটাই আমার। তাই শুরুতেই সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই।

আজ এই বক্তৃতামালার সংকলনের গোড়ায় তাঁর জীবনকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেয়ে আমি অভিভূত।^১ মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবন (১৯২৮-১৯৭৮)! কিন্তু কত কী করেছেন! ওই বয়সেই প্রশাসনিক দক্ষতায় কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন। তার চেয়েও বড় কথা, ওই দক্ষতার এমন সৃষ্টিশীল প্রায়োগিক বিকাশ ঘটিয়েছেন, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকাঠামো রচনায় ও তার পরিচালনায় স্থায়ী নির্মাণ-কলার ছাপ রেখে গেছে। এই বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের প্রতিষ্ঠাতেও ছিল তাঁর অগ্রণী ভূমিকা। তাঁকে মনে রেখে পুণ্যলাভ আমাদেরই। এবং এই প্রতিষ্ঠান যে তার আনুষ্ঠানিক সুযোগ করে দিয়েছে, সে জন্য তাকে-ও-তার পরিচালকমণ্ডলীকেও ধন্যবাদ।

আরো একজনকে এই সঙ্গে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। তবে তার আগে অকপটে কবুল করি, এখানে বাংলায় বলা ঠিক হবে কিনা, এনিয়ে আমার দ্বিধা ছিল। আগের বারো জন বক্তার ভিতরে এগারো জনই বলেছেন ইংরেজিতে। অতি তুখোড় অতি দক্ষ দখল তাঁদের ওই ভাষায়। আমি ইংরেজি ভালো জানিনা। বাংলাতেও যে গুছিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারি, এমন না। তবু তুলনায়, মনে করি, বেশি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু প্রথা ভাঙার সাহসটুকু কী করে পাই? এইখানেই সহায় হন প্রয়াত অধ্যাপক ড. মোজাফ্ফর আহমদ। দেখলাম, ২০০৮-এ অষ্টম নুরুল মতিন স্মারক বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন বাংলায়। এখন অব্দি ওই একটিই।^১ ভাষায় তাঁর প্রাজ্ঞলতা, যৌক্তিকতা ও অন্তর্ভেদী যৌক্তিক নির্মাণ অনতিক্রম্য। তবু তিনি সামনে থাকায় ভরসা পাই। বছর বিশেক আগে তিনি যখন ছিলেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি, তখন তিনি আমাদের বাংলায় লিখতে উৎসাহিত করতেন। শুধু সমিতির জর্নালে নয়, অন্যান্য আর্থনীতিক মননশীল চর্চাতেও। আজ এখানে সেই-সব মনে করে, তিনি নেই, এই আক্ষেপ নিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি বিনম্র প্রণতি জানাই।

তারপরেও, অস্বীকার করতে পারি না, এমন কেউ কেউ থাকতে পারেন, যাঁদের কাছে বাংলা ভাষা অচেনা, অথচ এই বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান অগাধ। বিদেশি হলে তাঁকে ডেকে এনে কথামালার সারস ও শিয়ালের গল্পের দশা হওয়া সম্ভব। তাছাড়া আমাদের শিক্ষিত মহলও এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে ইংরেজিতে চর্চায় যতটা অভ্যস্ত, বাংলায় ততটা নয়। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্যেও ইংরেজিই উপযোগী, এবং সে কারণে সেদিকেই আমাদের ঝোঁক। এটা অযৌক্তিক নয়। অর্থনীতির প্রথম পাঠে বিকল্পায়ন ও উত্তরায়নের ধারণা এমন আচরণই সম্ভব বলে নির্দেশ করে। এগুলো উড়িয়ে দেবার নয়। তাই পরিশিষ্টে আমার অপটু ইংরেজিতেই যা বলতে চাই, তার একটা সারমর্ম দেবার চেষ্টা করি। চাইলে তাঁরা অগত্যা তাতে কান দেবেন, এছাড়া আর কী-ই বা বলতে পারি!

আরো একটা কথা শুরুতে বলে রাখি। ইংরেজিতে ‘মানি’ (Money) শব্দে যেমন তার ব্যবহারিক রূপ এবং প্রয়োগের অভ্যন্তরীণ ও অন্তর্জাল চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বাংলায় ওই-রকম কোন একক শব্দে তার সবটুকু এবং ওই সবটুকুই- ফুটিয়ে তোলা বেশ মুশকিল। ‘মুদা’, ‘টাকা-কড়ি’, ‘টাকা-পয়সা’, এদের সবগুলোই খাটে, কিন্তু সব জায়গায় একরকম না। শব্দের এই বহুত্বকে তাই মেনে নিতে বাধ্য হই। কথাটা ঠিকমত বলা হলো কিনা, সেইটিই দেখবার। এটা ভাষার সীমাবদ্ধতার নয়, তার ভিন্নতারই পরিচায়ক। তাকে অস্বীকার করে কোন একক শব্দের অধিকারপ্রতিষ্ঠা করতে গেলেই বরং বিভ্রান্তির আশংকা বেশি। আরো কিছু শব্দের বেলাতেও এমনটি ঘটতে পারে।

এটাও জানাই, বিষয়টি এমন, যাতে কোন সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত আমার আয়ত্তের বাইরে। আদৌ তা সম্ভব কী না, এ প্রশ্নও মনে জাগে। জীবন গতিশীল, এবং প্রতিটি মুহূর্ত

ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী। সেখানে সম্ভাবনারাশি একাধিক, এবং প্রত্যেকটির ন্যায় দাবি করে তার কল্যাণের নিজস্ব গতিমুখ। পূর্ব-নির্ধারিত কর্তব্য-অকর্তব্যের তালিকা নিয়ে শুরু করলে, এবং বিশ্বাসের দুর্গ রচনা করে সেখানে বসে মুশকিল আসানের মন্ত্র জপ করলে মনের শান্তি নির্বিঘ্ন হতে পারে, কিন্তু সমাধান-সূত্র কিছুই আমার কাছে ধরা দেয় না। আমি বড় জোর আমার ভাবনাগুলো এখানে সবার সামনে মেলে ধরতে পারি। হতে পারে, এলোমেলো-খাপছাড়া। কর্মকুশল নুরুল মতিন বা প্রাজ্ঞ মোজাফফর আহমদ নিশ্চয় এতে খুশি হতেন না। কিন্তু এছাড়া অন্যভাবে কিছু ভাবা বা করা আমার সাথে কুলোয় না। তাই বলে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাই না। যথোচিত শনাক্ত করে তাদের সমুচিত সাজা আপনারা নির্দেশ করবেন, এইটিই কাম্য। কোন সাড়া না জাগলে বুঝতে হবে, গোটা আয়োজনই ব্যর্থ। এতে চিন্তা এগোয় না। কাজেও গতি আসে না।

আমরা জানি টাকা-পয়সা নিয়ে ব্যাংকের কারবার। অর্থনীতিতে বর্ণপরিচয়ের পরপরই আমাদের শেখা হয়ে যায়, টাকা যা করে, টাকা তাই-ই। এবং এই করার তালিকায় প্রথমেই আছে, তা বিনিময়ের মাধ্যম। এই মাধ্যম হবার কারণে তা পণ্য-রাশির প্রতিটির মূল্যের সঠিক পরিমাপক। টাকায় মান স্থির হয় বলেই পরস্পর সম্পর্কহীন বিভিন্ন দ্রব্যের একই কাল-বিন্দুতে অনায়াস বিনিময় নৈর্ব্যক্তিক নিরবচ্ছিন্নতায় সম্ভব হয়। এছাড়া ভবিষ্যতের দেনা-পাওনার হিসাব টাকাতে লিখে রাখা চলে। তারই পরিপূরক হিসেবে, টাকা জমিয়ে তাতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত কেনাকাটায় যে কাঙ্ক্ষিত মূল্য-সঞ্চয় সম্ভব, তার ধারণা একটা গড়ে দিতে পারে। নিজে সে কোন মূল্য-সৃষ্টি করে না। কিন্তু বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সব উৎপাদিত মূল্যের পরিমাপ সে করে। সমাজে একজনের সঙ্গে অন্যের ওই মূল্য-বিনিময়ে- সঞ্চিত, অথবা, অর্জিত- একটা সুসম্বন্ধ সামঞ্জস্য সে আনে। বলা যায়, মানুষের সমাজ-সভ্যতার এ সমান বয়সী। মূল্য-বিনিময়, অথবা, মূল্য-সঞ্চয় ঘটে টাকায় দামের হিসেবে। মানুষ তারই সূত্রে অতীতের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজে-কর্মে নতুন মূল্য-সংযোজনে অথবা অব্যাহত নতুন-নতুন মূল্যের ব্যবহারে রপ্ত থেকে ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ায়।

আপাতদৃষ্টে টাকার এই ভূমিকায় কোন জটিলতা নেই, একে অন্যের পথ করে দেয় তারা। সব মিলিয়ে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে-সংযোগে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ-উপভোগ সচল রাখে। অবশ্য এ সর্বাত্মক সবসময়ে সর্বাঙ্গিক, এমন দাবি অযথার্থ। আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা, তার পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট, এ'সবের ওপর তা অনেকখানি নির্ভর করে। যেখানে খামার-অর্থনীতির আনুপাতিক গুরুত্ব অনেক বেশি, অধিকাংশ কৃষক-পরিবার স্বয়ম্ভর, সেখানে টাকার প্রচলন তুলনায় কম। আমাদের এই বাংলাদেশেই পঞ্চাশ বছর আগে শতকরা সত্তর ভাগের ওপর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ছিল মুদ্রা-ব্যবহারের বাইরে। আজ অবস্থাটা ঠিক

বিপরীত। মানুষের জীবনযাপনে শতকরা পাঁচাত্তর ভাগের মত কর্মকাণ্ড মুদ্রা-নির্ভর। এবং ওই মুদ্রার ব্যবহারে ব্যাপকতা, গভীরতা ও বৈচিত্র্য ক্রমবর্ধমান। তবে যে কোন সময়েই হাতে টাকা থাকা, অথবা টাকা ব্যবহারের অধিকার হাতে থাকা একটা বড় সহায়। ধন-ঐশ্বর্যের তা সমার্থক। এবং এখানে টাকার ওই কার্যাবলির স্বতস্কৃত স্বয়ংক্রিয়া ও ধারাবাহিক তালমিল তাকে ছাপিয়েও গোটা সমাজকে স্থিতিশীল রাখে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দৈবদুর্যোগ না হলে তার ওপর নিশ্চিত নির্ভর করা যেত আগেই বরং বেশি।

কিন্তু এই সামঞ্জস্য অবশ্যস্তাবী নয়। জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ, উৎপাদন কৌশল ও উৎপাদন-কর্মকাণ্ড যদি অবিরাম এক থাকতো, তবে টাকাও তার সকল কাজে অবিকল ও অবিচল মহিমায় একই রকম থাকতো। বাস্তবে তেমন কদাচিৎ ঘটে। বিনিময়-মাধ্যম, এই স্বতঃসিদ্ধ বার্তা ছাড়া আর কিছুই টাকার স্থির নয়। পণ্যরাশির টাকায় মূল্যমানে হেরফের হওয়া মানে বিপরীত দিক থেকে টাকার নিজের মূল্যমানেই পরিবর্তন ঘটা। ভবিষ্যৎ লেনদেনের হিসাব তাহলে নিশ্চিতভাবে স্থির থাকে না। যদিও কাগজে-কলমে ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্মে তার ওপরেই নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই। টাকায় বিষয়-আশয়ের মূল্যমান আমরা ঘোষণা করি; কিন্তু নিজেই সে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।^৩ তাকে আর অকর্মক ভাবা যায় না। কর্ম-সম্পাদনে তার ভূমিকা কেবল মধ্যপদলোপী থাকে না। নিজেই সে প্রবলভাবে সক্রমক হয়ে পড়ে। কেনা-বেচার বাজারে সে নিজেও একটা পণ্য, বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তার ওপর কর্তৃত্ব, এবং তার মূল্যমান, অন্য যে কোন ক্রয়যোগ্য বিষয় হাতে পাবার ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ধারণ করে। বাজার যত ছড়ায়, সমাজ যত তাকে মান্য করে, টাকার গুরুত্বও তত বাড়ে। স্বয়ং এটা গতির বাহন, এবং অগ্রগতির চ্যালেঞ্জ। ভালো-মন্দ নির্ভর করে কীভাবে সমাজ তার মোকাবিলা করে, তার ওপর। অবশ্য ভাল-মন্দ কোন নিরপেক্ষ বাস্তবতা নয়। স্থান ও কালে চলমান-বর্তমান-মানব-মানবীর সমস্তটার স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ তাতে মিশে থাকে।

টাকা যে কেবল বিনিময়-মাধ্যম থাকেনা, নিজেও একটা পণ্য হয়ে দাঁড়ায়, এবং একইসঙ্গে ওই পণ্য-মূল্যে দিক নির্দেশ করে বাজারের কারবারের, এইখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে ব্যাংক-ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ। এ যে কেবল আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাতেই প্রভাব ফেলে, তা নয়, মোঘল আমলেও আমরা দেখেছি, একচেটিয়া অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে টাকার প্রচলন, কীভাবে তার প্রভাব পড়ে রাজকোষের ওপরেও।^৪ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্ষমতার রাজনীতি দৃষ্টচক্রে জড়িয়ে পড়ে। তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। যদিও বাজারের হালচাল তখন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র সরাসরি স্পর্শ করে, এবং ওই জীবনের ছকে তার আঁচড় তেমন পড়ে না। সমাজের ওপরতলে পালাবদল অবশ্য ঘটে চলে। এদিকে আজকের বাস্তবতায় যোগাযোগ অনেক বেশি নিবিড়।

ছা-পোষা-সাতে-পাঁচে নেই মানব-মানবীর জীবনেও ব্যাংক-ব্যবস্থার নানান উদ্যোগ, এবং সেই সূত্রে টাকার তৎপরতা ও মূল্যমান প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শ্রমের চাহিদা ও জোগানে ছোট-বড় নানা রকম ঢেউ তুলে অবিরাম প্রভাব বিস্তার করে চলে। যেহেতু সবকিছুর মূলে প্রত্যাশার হিসাব-নিকাশ, তাই পরিণাম অনিশ্চিত। তবু সেখানে উদ্দেশ্যের যৌক্তিক ভিত্তি বিবেচনায় নেওয়া চলে। ওই বিবেচনায় ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের তাগিদের সঙ্গে সার্বিক কর্মপ্রবাহের সম্ভাব্য চিত্রটিও মাথায় রাখা জরুরি। কারণ, শেষ বিচারে ব্যাংক-ব্যবস্থায় সফলতার বা বিফলতার পরিণাম-ফল সামষ্টিক।

আমাদের এই বাংলাদেশে প্রশস্ত মুদ্রার শতকরা প্রায় আশি ভাগ ব্যাংক-ঋণ সঞ্জাত।^৫ ধার দেওয়া-নেওয়াই ব্যাংকের কারবার। টাকা পণ্য হয় সেই সুবাদে। জনগণের সঞ্চয় ব্যাংক জমা রেখে তাদের সুদ দেয়। আবার ওই সঞ্চয়ের টাকা বাড়তি সুদে খাটিয়ে লাভ করে। এই তার ব্যবসা, এবং এইভাবে বিহিত মুদ্রা ছাপিয়ে সমাজে টাকার বিস্তার। ব্যবসা ভাল চলে যদি সঞ্চয় ও ঋণের চাহিদা, দুই-ই তেজি থাকে। তার মানে আয়-প্রবৃদ্ধি হার জোরালো হতে হবে, বিনিয়োগ চাহিদাও আরো বেশি হারে বাড়তে হবে। বিনিয়োগ বাড়লে কর্ম-নিয়োগ বাড়ে। গণ-মানুষের আয় বাড়ে, অথবা তার নতুন সৃষ্টি হয়। অর্থনীতি সচল থাকে। এগোয়। মাঝখানে থেকে ব্যাংক এই গোটা প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করে। এটা সম্ভব হয় তখনই, যখন ব্যাংকের এবং ব্যাংক-জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর মানুষের আস্থা থাকে।^৬ সঞ্চয় তাদের খোয়া যাবেনা, সুদের টাকা তারা যথারীতি পাবে, বিনিয়োগ ঠিক ঠিক ঘটবে, এবং সেখানে কেউ জালিয়াতি করবে না, এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকার ওপরেই নির্ভর করে ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যকারিতা, কল্যাণকরতা ও গতিশীলতা। প্রকৃতপক্ষে তা গোটা অর্থনীতির স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলোই চিনিয়ে দিতে পারে। বাস্তবে তা দেয়ও। এবং এইখানেই আসে গোটা সমাজের প্রেক্ষাপটে তার আপেক্ষিক যৌক্তিকতা, গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতার প্রশ্ন। কারণ যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় সিদ্ধান্ত-বিন্দু অথবা বিন্দু-সমষ্টি একক-অবস্থা তুলে ধরলেও সম্ভাব্য পছন্দ-ক্ষেত্রে অসংখ্য বিন্দুর সমাহার। সেখানে কোনটা উত্তম, এটা কীভাবে যাচাই করি? কালের মাত্রা যোগ করলে প্রশ্ন আরো বহুদিকে-বহুমুখে যায়। সবার বিচারে অগ্রাধিকার এক থাকে না। ফলে জটিলতা বাড়ে। অনিশ্চয়তায় আপেক্ষিক উত্তরায়নের কথাই যতটা সম্ভব ভাবা যায়। এবং সেখানেও স্থান ও কালের প্রত্যয়রাশি সবসময় অভিন্ন থাকবে, এমনটি আশা করা অনুচিত।

স্পষ্টত টাকাই যেখানে পণ্য, এবং টাকায়-টাকার-যোগফলে যেখানে কারবারে সফলতা বা বিফলতার পরিচয়, সেখানে কেবলই গাণিতিক হিসাবে লাভ-লোকসানকে মুখ্য বিবেচনার বিষয় ধরা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু লাভের সঙ্গে সম্পর্ক ঝুঁকির, ঝুঁকির সঙ্গে টাকা হাতছাড়া করতে সময়ের যে কড়ার, তার। তা টাকা জমা রাখা, আর ঋণ দেওয়া, দুটোতেই। ঝুঁকি

বেশি হলে সুদের হারও বেশি। টাকার ব্যবহারের কেনা-বেচায় তাই তার তারল্যের তারতম্য, অর্থাৎ বিহিত মুদ্রায় তা হাতে পাবার নিশ্চয়তায় সময়ের পরিমাপে তফাৎ তার দামে কম-বেশি ঘটায়। নিশ্চয়তা যত কম, দাম বা সুদ তত বেশি। ব্যাংকের কারবারে নিট লাভ ধরা পড়ে টাকার কারবারে মোট লেনদেনে সুদ দিয়ে আর সুদ নিয়ে কী পরিমাণ উদ্ধৃত তার হাতে থাকে, তাই দিয়ে। অথচ এই টাকার কিছুই তার নিজের নয়। অন্যের সঞ্চয় জমা রেখে সেইটিই সে বাড়তি লাভের আশায় খাটায়। ঝুঁকিটা সে নেয়। আর সবকিছু ঠিক-ঠাক চললে ঝুঁকি নেবার পরিণামে যে লাভ, সেটা তার প্রাপ্য। এতে অন্যায় কিছু নেই। ব্যাংকের ধর্মাধম, বা ব্যাংকিং এথিক্‌স্ একে কেন্দ্রীয় নির্ধারক বলে মান্য করে। আর দেওয়া ঋণের টাকা যদি সমাজে উৎপাদনশীলখাতে খাটে, সেইসঙ্গে কাজ-কর্মের ও জনগণের রোজগারের বিস্তার ঘটে, তবে তাতে গোটা সমাজেরই উপকার বাড়ে। অবশ্য আমরা ধরে নিই, টাকার ব্যবহারে পুঁজি সৃষ্টি হবে, পুঁজির বিনিয়োগ শ্রমের কর্মক্ষেত্র বাড়াবে, কাজ উৎপাদনে রূপান্তরিত হবে, উৎপাদন ভোগে, সঞ্চয়ে ও পুনরুৎপাদন কর্মকাণ্ডে প্রবৃদ্ধি আনবে।

ব্যাপারটা কিন্তু সরলরেখায় ঘটে না। ঝুঁকি ও প্রত্যাশার মান কখনোই স্থির অঙ্কে নির্দেশ করা যায় না। এবং অর্থনীতির প্রথম পাঠেই জানা যায়, হিসাবমাফিক ব্যাংকের সম্পদের স্তর-বিন্যাসে তার তারল্য ও উপার্জন ক্ষমতার ভিতরে একটা বিপরীত-মুখী সম্পর্ক সবসময় কাজ করে চলে। ফলে প্রত্যাশিত লাভ হাতে আসতে পারে, না-ও পারে, আবার বাস্তবে লাভের অঙ্ক প্রত্যাশাকে ছাড়িয়েও যেতে পারে। এগুলো মাথায় রেখেই ব্যাংকের ঋণ-বিনিয়োগ। এইটিই তার কারবার। শুধু এই দৃষ্টিকোণ থেকে এতে অন্যায় কিছু নেই।

কিন্তু অন্যায় মাশুল গোণার যে সমূহ সম্ভাবনা থাকে, এটা অস্বীকার করা যায় না। এই মাশুল গোণে গোটা দেশ অর্থাৎ দেশের আপামর জনগণ। অত্যধিক লাভের আশায় বেশি ঝুঁকি নিয়ে সামলাতে না পারলে ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হতে পারে। একটা থেকে আর একটা। তাতে টাকার বাজারে, এবং পরিণামে পুঁজির বাজারে যদি ধস নামে, তবে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই মুখ-থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা। সম্ভাব্য পরিণাম তার ভয়াবহ। এ ব্যাপারে সতর্ক না থাকাটাই এখানে অপরাধ। এককভাবে, অথবা মিলিতভাবে তার দায় এসে পড়ে ব্যাংক ও অনুরূপ ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর। তাকে প্রতিহত করার জন্য ব্যাংক-ব্যবস্থায় ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বাজারের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে সতর্ক থাকা প্রতিষ্ঠানসমূহের এক সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। এবং ব্যাংক-ব্যবস্থা বলতে এখানে শুধু সরকারি- অনুমোদিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোকেই বোঝানো হচ্ছে না, যারা টাকা আমানত নিয়ে গ্রাহকদের রাতারাতি বড়লোক করার স্বপ্ন দেখিয়ে ব্যবসা ফাঁদে, তাদের কাণ্ড-কারখানাও মাথায় রাখা হচ্ছে। তবে এ শুধুই পরিণামবাদী (কনসিক্যুয়েনসিয়াল) নয়; কারণ পরিণাম নিশ্চিত নয়। প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে অসংখ্য উদ্দেশ্য ও অসংখ্য ক্রিয়া। তাদের কার্য-কারণ-সম্পর্কের মিলিত

রূপের একক চেহারা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভবই। অতএব এ সব কিছু মনে রেখে নিয়মনীতির ছক একটা যদি খাড়া করি, তবে ওই ছকই কর্তব্যকে নিশ্চিত করে বেঁধে দিতে পারে। কাজেও সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা আসে। আর কিছু ভাবার প্রয়োজন করে না। কর্তব্যসূত্রই যথেষ্ট (ডিঅন্টোলজিক্যাল)।^১ কিন্তু স্থানের ব্যাপকতায় ও কালের অবারণীয়-অপ্রতিহত বিস্তারে কর্মের গতিমুখ কর্তব্যের শিলীভূত নির্দেশনাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে। এবং যেতে পারাটাই জীবনের ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কাজেই এভাবেও কোন সমাধানের প্রামাণ্য ধারণা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যদি-কিন্তু বৃত্তেই (হাইপোথেটিক্যাল-কণ্ডিশনাল) ঘুরপাক খেতে হয়। একটি ‘হাঁ’ অসংখ্য ‘না’-এর জন্ম দিতে পারে। ব্যাংক-ব্যবস্থার ভালো-মন্দর বিবেচনায় এগুলো আরো প্রাসঙ্গিক।

এই যে ব্যাংকের কারবারে, লাভের পেছনে ছোট্ট-আমানতকারী ও বিনিয়োগকারী উভয়েরই- এটা প্রত্যেকের নিজের-নিজের হলেও তার প্রতিক্রিয়া যে ছড়ায় সমাজের সবরকম কাজে, এবং ওই কাজেরও আছে কার্য-কারণ-সম্পর্ক-সম্বন্ধে বহু ঘটনায়-বহুরকমের সম্বরণ, তাতে এক জায়গায় রাশ হাতের মুঠোয় ধরে সব কিছুর দায় মাথায় নেওয়া মানুষী সাধের বাইরে মনে হয়। আবার কোথাও কোন দায় নেই, এটাও এক দায়িত্বহীন বার্তা। অনেক সময় নিজেদের অজান্তেই আমরা এই দায় বয়ে বেড়াই। এ থেকে নিস্তার নেই। কালের উনুনে বাস্তব স্বয়ং জ্বালায়-পোড়ায়-উল্টে-পাল্টে সেদ্ধ করে, ভাজে। তাতে ন্যায়-অন্যায়ও নানা জায়গায় নানাভাবে ভোল পাল্টায়। নিয়ম-নীতির যথার্থতাও কোন অদ্রাস্ততা দাবি করতে পারে না। আপেক্ষিক বাস্তবে ওই দাবি স্বয়ং মূর্তিমান অসংগতি। এথিক্স বা সুনীতির কর্তব্য-তালিকা তাই প্রহেলিকাই থেকে যায়। তা ব্যাংক-এর কারবারে লাভ-লোকসানের বিবেচনাতেও। এবং তার পিছনে সমাজ-সংস্কারে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস-আচার-আচরণ যে প্রত্যয়সিদ্ধি ঘটায়, তা-ও দুর্ভোগের বীজ পোঁতে, বীজ ছড়ায়, যদিও সমাজ-বিভ্রান্তির আনুকূল্য তাতে অক্ষুণ্ণই থাকে। লাভ-লোকসানে উৎপাদিকা শক্তির সম্পর্ক-বিন্যাসের গতি-প্রকৃতি ছাড়াও পাপ-পুণ্যের অলীক কল্পনাও ঢুকে পড়ে। এতে কাজে-কর্মে অনর্থই শুধু ঢুকে পড়ে না, অশেষ বিনষ্টির তা কারণ হয়। বিশ্বাসের দুর্গ ন্যায়-অন্যায়ের যৌক্তিক প্রবাহকে প্রতিহত করে।

খৃষ্টপূর্ব প্রায় তিনশ বছর আগে কৌটিল্য রচনা করেন রাষ্ট্রিক অর্থ-ব্যবস্থার প্রথম আকরগ্রন্থ ‘অর্থশাস্ত্র’।^২ তাঁর তিজ্ঞ মন্তব্য ভিক্ষায় কখনোই লক্ষ্মীলাভ ঘটে না। ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে এর তাৎপর্য হলো, যেখানে প্রযুক্তিতে ভিতর থেকে কোন পরিবর্তন নেই, উৎপাদনে প্রসার ঘটে কেবল কৃষিকাজে, এবং সৃষ্ট মূল্যের আপেক্ষিক বৃদ্ধি ঘটে বাণিজ্যে, সেখানে লক্ষ্মীর বাস বাণিজ্যেই, অর্ধেক তার কৃষিকাজে আর তারও অর্ধেক রাজসেবায়, কিন্তু ভিক্ষা সম্পদ-সৃষ্টির কোন কারণ হয় না। ইঙ্গিতটা এখানে স্পষ্ট। বর্ণ-বিভাজন প্রথায় ব্রাহ্মণরাই একমাত্র

পরশমজীবী। স্পষ্ট করে বললে ভিক্ষান্নভোজী। তাকে মহত্ব দিতে শাস্ত্রচর্চায় অধিকারের দোহাই দিয়ে তাদের হাজার রকম কৌশল। দেব-ব্রাহ্মণের মহিমা-কীর্তনে অক্লান্ত থাকা। এই অপচয়ের ভর্ৎসনা পাই উপনিষদেও।^৯ তবে যেহেতু উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আসে না- পাঠান বা মোষল আমলেও না, তাই ধর্মীয় পরিচয় যার যেমন হোক না কেন, বর্ণ-বিভাজন প্রথা ও তার অনুষ্টি, পরশমজীবীর উৎপাদন-বন্টনে অংশভাগে সম্মানজনক ভূমিকা অক্ষুণ্ণই থেকে যায়। দেব-দ্বিজে ভক্তি ও তাদের অনুকূলে বৈষম্য হয়ত তখন অনেকের কাছে ছিল পুণ্য-লাভ-ও-মানস-তৃপ্তির উপায়। সামাজিক মূল্যমানের সূচককেও তা ওই প্রেক্ষাপটে নিশ্চিতভাবে উর্ধ্বগামী করে। ছাপ পড়ে তার টাকা-পয়সার বাজারেও। উৎপাদনশীল নিম্নবর্ণের জনসমুদয়ের কাছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে টাকা ধার দিলে যেখানে সুদের হার ছিল শতকরা পাঁচ, উচ্চবর্ণের অনুৎপাদক ভদ্রজনের কাছ থেকে তা চাওয়া হতো শতকরা দুই-হারে। যুক্তিটা বোধহয় এইরকম: উৎপাদনে লাভের আশা থাকে সুদের চেয়ে আরো বেশি। পরগাছাদের সে সুযোগ নেই। তাদের থাকাটাই বড় কথা। সমাজের স্থিতিশীলতার জন্যে; পরকালের ভাবনায় আর সবাইকে নিশ্চিত করার জন্যে। কিন্তু সমাজ-কল্যাণ এতে এতটুকু বাড়ে না। ভবিষ্যৎকে বরণ তা বিপদ-সংকুল করে। ইতিহাস সেই-রকমই দেখায়। বিন্দুমাত্র করুণা করে না। যদিও পুণ্যলোভী মানুষের সমর্থন তা পায়। তখন। ভিন্নতর প্রেক্ষিতে অনুরূপ কাণ্ডে আমাদের দেশে এখনও। পেছনে থাকে পশ্চাৎমুখী কায়মি-স্বার্থের কুটকৌশল। ক্ষমতার রাজনীতিতে তার প্রভাব কম নয়। এবং তা অশিক্ষা-কুশিক্ষা নিরপেক্ষ।

আঠারো শতক থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় সমাজ-রূপান্তরের দিকে দৃষ্টি দিলে সবকিছু ধরা না পড়লেও বিষয়টির গতি-প্রকৃতির আভাস একটা পাওয়া যায়। তখনও ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বড়-বড় রাজা-জমিদার যারা তারাই, নিজের নিজের এলাকায় সর্বেসর্বা। নবাব-বাদশাদের বৎসরান্তিক পাওনা মিটিয়ে দিলেই তাঁরা খুশি। ক্ষমতার পাশা খেলায় না জড়ালে, অথবা, পারিপার্শ্বিক ঘটনা-জালে বাধ্য না হলে তাঁদের কারো রাজভূমিতে উর্ধ্বতন ক্ষমতার নাক গলাবার কোন কারণ সচরাচর চোখে পড়ে না। এই রাজপুরুষরা ইচ্ছামত দেবোত্তর-ব্রহ্মোত্তর ভূ-সম্পত্তি বিলিয়েছেন। বিলিয়েছেন পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্যান্য উপাসনালয়ের জন্যেও। অধিকাংশই নিষ্কর। কর দিতে হলেও নাম-মাত্র।^{১০} পরে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি একচেটিয়া ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসার পর সূর্যাস্ত আইনে বা দশ-শালা বন্দোবস্তের কড়াকড়িতে জমিদারি ছারে-খারে গেছে, তবে ব্রাহ্মণ বা ভজনালয়ের ভূ-সম্পত্তির ওপর তেমন কোন হাত পড়েনি। অনেক করিৎকর্মা উচ্চবংশীয় জমিদার ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ব্যবসাতেও টাকা খাটিয়ে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করেন। ১৭৯৩-তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হলে তাঁরা কেউ কেউ হাতে-আসা কাঁচা টাকায় জমি কেনেন। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পরিচালিত হয়েছে, এমনটি বলা যায় না।

প্রাক-বৃটিশ আমলেও জমির মালিকানার সাম্প্রদায়িক নিবেশন ভিন্ন-রকম ছিল না। তবে পিরামিডের মাথায় নবাব-বাদশার অবস্থান একরকম নিশ্চিত ছিল। তারপরেও ক্ষমতার যাদুবৃত্তে যাঁরা প্রবেশাধিকার পেতেন, তাঁদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় সাধারণত কোন সময়েই প্রধান হয়ে ওঠেনি। রায়তদের কাছে জমির প্রাপ্তিযোগ্যতাও তেমন কোন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ, কৃষিকাজে জনসংখ্যার অনুপাতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ যথেষ্টই ছিল। সার্বিক বিবেচনায় ওই সময়ের সমাজ-বাস্তবতায় বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিক মানদণ্ড যে পরিকল্পিতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল, একথা তাই অদ্রাস্তভাবে দাবি করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

তবে বৈষম্যের ও সামাজিক অন্যায়েব বিষ ঢুকে পড়ে এই পথেই। উচ্চবর্ণের অনেক জমিদারেরই সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতে হাল-লাঙল স্পর্শ করা বারণ। তাঁরা নির্ভর করেন জোতদারদের ওপর। জোতদারদের সরাসরি যোগাযোগ রায়তদের সঙ্গে। জমির অধিকার তাদের নয়। হয় তারা বর্গা-চাষী, নয়ত খাজনা-দেয়া প্রজা। মূল্য সৃষ্টি করে তারা। কিন্তু মূল্যের লভ্যাংশ বেশিরভাগ চলে যায় অনুৎপাদক জমিদারদের ও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকর্তাদের পকেটে। সামাজিক ন্যায় নীতি কার্যত অন্যায়েকেই প্রশ্রয় দেয়। দৃষ্টি-বিশ্রমে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দেয় অবজেকটিভ কো-রিলেটিভ হয়ে। এতে সবচেয়ে বেশি মার খায় সহজে-আক্রান্ত সবচেয়ে-দুর্বল, হাড়-ভাঙা-খেটে জীবিকার অন্তেষণ করে যারা, তারা। জমিদারি প্রথারও উচ্ছেদ হয় অবশ্য। কিন্তু ভুক্তভোগী ভিন্ন সম্প্রদায়ের গরীব চাষী-দিনমজুরেরা ওই প্রথার কোন সহায়ক শক্তি ছিল না। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় তাদের সঙ্গে নিয়েই জমিদারি রদের ডাক দেওয়া যেত। তা হয়নি। ন্যায়-নীতিও দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। হাতে যা এসেছে, তাতে কল্যাণ নিশ্চিত হয়নি। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটেনি। বধুগনাই শুধু বেড়েছে। অথচ এর মূলে থেকে গেছে দেব-দ্বিজে-ধর্মপ্রতিষ্ঠানে, সে যেমনই হোক, কাণ্ডজ্ঞানহীন-পশ্চাত্মুখী আনুগত্যের ধারা। উত্তেজিত করা যায় তাকে সামাজিক ন্যায়েব যুক্তি-কাঠামো রচনা করেই। এবং তা যে একেবারে অমূলক থাকে, তা-ও নয়। ন্যায়-অন্যায়েব শুদ্ধ বিচার বোধহয় নাগালের বাইরেই থেকে যায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুঞ্জীভবনের প্রক্রিয়া তাকে আরো ঘোলাটে করে তোলে। ব্যাংক-ব্যবস্থায় টাকার চলাচল ওই প্রক্রিয়ার একটা সহজ হাতিয়ারে পরিণত হয়, যদিও এই চলাচল এককভাবে আপনা থেকে কোন নিয়ম-নীতির লংঘন ঘটায় না। এটা আজকের এই বাংলাদেশেও প্রকটভাবে বাস্তব। অনুৎপাদকের হয়ে, বিশ্বাসের নামে অথবা তাদের প্রথার অনুকরণে জিগির তোলা যায়। ব্যাংক-ব্যবস্থাও তাতে সায দিতে, অথবা তার সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়। জনগণের পছন্দরাশিতে তার মূল গভীরে।

উনিশশ সাতচল্লিশে আমাদের প্রত্যাশা জেগেছিল, বিপুল কৃষিজীবী মানুষ আত্মশক্তিতে, এবং, আত্ম-অধিকারে বলীয়ান হয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থা বরং উল্টো তাদের সম্বন্ধকে, নিয়ম মেনেই, পশ্চিম ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত করে চলে, টাকার অতি-মূল্যায়ন পশ্চিমখণ্ডে শিল্পায়নে পুঁজিপণ্য আমদানিতে সহায় হয়, কিন্তু আমরা আমাদের কৃষিপণ্য রপ্তানী থেকে ন্যায় মূল্য পেতে বঞ্চিত হই। এখানেও ব্যাংকের যোগাযোগ আমাদের ঠকায়, যদিও অর্থনীতির তত্ত্ব-কাঠামোয় তারও ন্যায়সংগত যৌক্তিকতা মেলে। এদেশের মানুষের স্বপ্নভঙ্গ ঘটতে দেরি হয় না। তবে পশ্চাত্মুখী ধ্যান-ধারণার বিরতিহীন প্রচারণা তাদের বিভ্রান্তও করে চলে। একান্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেও তাতে ছেদ পড়েনি। এই দ্বন্দ্বিক বাস্তবতায় ন্যায়-অন্যায়ও তালগোল পাকিয়ে যায়। কারণ, বিভিন্নজন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারে। অবশ্য শেষ বিচারে গণমানুষের খেয়ে পরে বাঁচার, ও আরো ভালোভাবে বাঁচার সুযোগ যদি সৃষ্টি হয়, এবং তা অব্যাহত থাকে, তাহলে সেইটিই ন্যায়ের পক্ষে অভিযাত্রা বলে গণ্য করা যায়। ঐতিহ্য-লালিত চিরায়ত স্থিরবিন্দুর পিছুটান এখানে কাম্য নয়, যদিও হতে পারে তা অনেকের কাছে মনোহর। সামাজিক, ও, বিশ্বাস-তাড়িত অনেক অভ্যাস ও কর্মকাণ্ড বিপুল অপচয়ের কারণ হতে পারে। পুঁজির বহুজাতিক বিস্তারের প্ররোচনায় উত্তর উপনিবেশিক ও উত্তর-আধুনিক ধ্যান-ধারণা তাকে প্রশ্রয়ও দেয়। কারণ, তাতে রাষ্ট্রের দুর্বলতা বাড়ে, ও, মুক্তপদ পুঁজির একাধিপত্য ছড়ায়। বাজারও তার অনুগত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ তার করার এবং হবার অধিকার তুলনামূলকভাবে বেশি-বেশি হারাতে বসে। এতে ন্যায় বিপর্যস্ত হতে পারে, কিন্তু কোথাও কোথাও সুযোগসন্ধানী উটকো নাগরিকচক্র তাতেই উৎকর্ষের যোগসূত্র দেখতে পান। এটা আমরাও হাড়ে হাড়ে টের পাই। দেশি-বিদেশি প্রভাববলয়ের কর্তারা পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ে। তাদের অভিসন্ধি আমাদের ভালো-মন্দের বিচারে ঢুকে পড়ে। কিন্তু আমরা বেশিরভাগই তা টের পাই না। জ্ঞানপাপীদের কথা অবশ্য আলাদা।

ব্যাংক-ব্যবস্থা বিনিয়োগ এর আওতার বাইরে থাকে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংযোগের কারণে এমন অনেক ঋণদান কর্মসূচী অনুমোদন পায়, এমন অনেক কর্মনিয়োগ উৎসাহিত হয়, যা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শের নৈতিক ভিত্তিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। ব্যাপারটা শুধুই ব্যবসায় লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশে ধরা পড়ে না। ক্ষমতা-বিস্তারের ছলাকলায় নানা সূত্রে নানা উদ্যোগে তা ঢুকে পড়ে। ছড়ায়। মগজ কেনা-বেচাতেও কাজে লাগে। উপযুক্ত দামের আশায় অনেকে যে হা-পিত্যেশ করেন, এও অস্বীকার করা যায় না। হ-য-ব-র-ল অবস্থা একটা যদি তৈরি হয়, তবে তা এই অশ্বচ্ছ ভঙ্গুর বাস্তব পাটাতনে পা রাখারই পরিণাম। সুকুমার রায়ের ‘সাদাকে বলেছি লাল, লালকে

বলেছিস কালো’, তারও প্রদর্শনী চোখে পড়ে দিন-রাত। ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সুযোগ নিতে মুখিয়ে থাকেন স্বার্থান্বেষী ব্যস্তবাগীশেরা। আলাদা-আলাদাভাবে সুনীতি-দুর্নীতির প্রচলিত মাপকাঠিতে ফেলে এদের অনৈতিক বলার সুযোগ হয়ত তেমন থাকেনা। কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রায় ছাপ ফেলতে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে এদের কি অনুমোদন করা যায়? কোন-কোন ব্যাংক বা ব্যাংক-জাতীয় প্রতিষ্ঠান এসবে শুধুই কি মধ্যস্থ? না কি তারাও উৎসুক-উদ্যোগী পাকা খেলোয়াড়?

আমরা ঘর-পোড়া গল্প। কাজেই কথাটা মাথায় না-এসে পারে না। ফতেহ চন্দ জগৎ শেঠ ছিলেন আঠারো-শতকে ভারত-বিখ্যাত ব্যাংকার। স্বয়ং মোঘল বাদশা ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁকে ‘জগৎ শেঠ’ উপাধি দেন, এবং তা বংশানুক্রমিক থাকবে বলে ফরমান জারি করেন।^{১১} তিনি বাঙালি ছিলেন না কিন্তু মুর্শিদাবাদে তাঁর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন (পলাশির যুদ্ধের প্রধান কুশীলব প্রায় সবাই ছিলেন অবাঙালি, বাঙালি রাজা-রাজাদের কারো কারো ভূমিকা ছিল নিতান্ত পার্শ্বচরের। বাঙালি আবেগে একথাটা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই)। পলাশির যুদ্ধের দুষ্ট চক্রান্তে জগৎ শেঠ মহতাব চন্দ্রের ভূমিকা কী ছিল এবং তার পরিণাম কী হয়েছিল, তা শুধু এখানে মনে করিয়ে দিতে চাই। আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় কোন জগৎ শেঠ নেই; কিন্তু আমাদের দারিদ্র্যকেই মূলধন করে অভিনব মহাজনি ব্যবসা ফাঁদায় আন্তর্জাতিক লগ্নিকারকদের মদত খুব গোপন থাকে না। তার সাফল্যের অনন্য সাধারণ ভাবমূর্তি-একটা গোটা বিশ্বে তৈরি হয়। তারই অনুসরণে আমাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে তার কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে রাখার তথাকথিত উত্তর-আধুনিক প্রয়াস খুব ভালোভাবেই চোখে পড়ে। রাজার গায়ে কোন পোষাক থাক বা না-থাক, চারদিক থেকে দৈববাণী হতে থাকে তাঁর বেশ সবচেয়ে সুন্দর। তাঁর ছক কল্যাণ-ধর্মের বিকাশের প্রকৃষ্ট উপায়।

বাস্তবের ন্যাংটা ছেলে যা-ই বলুক না কেন, বিদ্যা-দিগ্গজ-ধনুর্ধরদের একটা ব্যান্ড-পার্টি বাজনা বাজাতে কসুর করেন না। কিন্তু এটা কি ভালো? অর্থনীতির ন্যায়, সমাজের ন্যায়, গণমানুষের, বিশেষ করে দরিদ্রতর মানুষের কল্যাণ ও মানসমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার এ কি আদর্শ পথ? না কি মোঘল দরবারে ফরমান পাওয়া ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মত বাইরের স্বার্থবাহী চক্রের হাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ সাঁপে দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে উষ্ণবৃত্তি খোঁজা? সেকালের জগৎ শেঠ কোন আর্থিক অনিয়ম করেন নি। মুদ্রার প্রচলন বাড়িয়ে বাজারে কেনা-বেচায় গতি এনে “আকালে”র হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাতেই কি তাঁর বংশধর মহতাব চন্দ জগৎ শেঠের পলাশি কাণ্ডের কলংক মোচন হয়? নবাবের আর্থিক চাহিদা মেটাতে কোন কসুর করেন নি যদিও। আজ গোটা বিশ্বের কর্মপ্রবাহে পুঁজি ও প্রযুক্তির চমকপ্রদ জটাজালে সুনীতি-দুর্নীতির সীমারেখা কোথায় কীভাবে টানি, তা নিশ্চিত করে বলা বোধহয় মুশকিলই।

কিন্তু তারপরেও টাকার বাজারে, বিশেষ করে ব্যাংক-ব্যবস্থায়, নিয়ম কানুন কঠোরভাবে মেনে চলার কোন বিকল্প নেই। তাতে শৃংখলা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার গুরুত্ব এখন আগের চেয়েও বেশি; এবং তা ক্রমবর্ধমান। উৎপাদনে, বন্টনে ও ভোক্তার আচরণে অর্থের ব্যবহারে প্রযুক্তিগত রূপান্তর, অভিনবত্ব, দ্রুততা ও বিস্তার যোভাবে সমাজের সর্বস্তরে মানুষের জীবনযাপনের চেহারা পালটে দিয়েছে, এবং আরো দিচ্ছে, তাতে বিধি-বিধানের প্রয়োগে টান-টান উত্তেজনার ভারসাম্য বজায় রাখা অতি আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। ওই ভারসাম্যও গতিশীল। কাজেই তাল মেলাতে পেরেছি বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার উপায় নেই। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেন প্রসারমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই তুলনীয় সংস্করণ। কোথাও নিয়মের এতটুকু বিচ্যুতি ঘটলেই গোটা আয়োজন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা। আবার নিয়ম ভাঙার প্রলোভনও প্রচুর। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘মর্যাল হ্যাজার্ড’, পদে পদে তার সম্ভাবনা। প্রত্যেকে মনে করতে পারে, আমি একটু সুবিধা নিই, আর কেউ না জানলে গোটা ব্যবস্থায় তা সমুদ্রে গোপ্পদ তুল্য, কোথাও কিছু আসবে-যাবে না, অথচ তার মোট চাপ হতে পারে বিপুল। গোটা অর্থ-ব্যবস্থাকেই তা তছনছ করে দিতে পারে। ব্যাংকিং-খাতে ‘মর্যাল হ্যাজার্ড’ এক সার্বক্ষণিক মাথাব্যথার কারণ।^{১২}

এখানে যোগ হয় আরও একটা বিষয়: আস্থা ও দক্ষতার সমন্বয়। ব্যাংকের ধর্মই হলো পরের ধনে কারবার। বিনিয়োগে পক্ষপাতিত্ব ঘটা স্বাভাবিক। ঘটেও। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব বেশি সুযোগ পায়। বিভিন্ন দেশে এভাবে বড়-বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও ওই প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সংযোগ গড়ে ওঠে। প্রভাবশালী গোষ্ঠীচক্র এভাবেই দানা বাঁধে। বাজার-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যদি তাদের হাতে চলে যায় তবে অবাধ হবার কিছু নেই। ঘটেও এরকম। সাধারণ মানুষ তাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। পণ্য ও শ্রমের বাজার দুটোই তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। চটজলদি অতিরিক্ত মুনাফা তারা উশুল করে নিতে থাকে। দাম তারা ইচ্ছামত বাড়ায়। ভোক্তার উদ্বৃত্ত-উপযোগ ও শ্রমের আপেক্ষিক মজুরি ক্রমাগত হ্রাস পায়। উৎপাদন দক্ষতা ফলে সর্বোত্তম বিন্দুতে পৌঁছায় না।

একটা অজুহাত ব্যাংক অবশ্যই খাড়া করতে পারে। যাদের ওপর তার আস্থা বেশি, তারাই ঋণ বন্টনে অগ্রাধিকার পায়। এটা অনৈতিক নয়। কারণ অন্যের টাকার ও তার বৃদ্ধির আশার নিরাপত্তা দিতে না পারলে ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। কোন ঝুঁকি কতটা নেওয়া যায়, সেটা তাকে ভাবতেই হয়। কিন্তু পরিণামে বৈষম্য প্রশ্রয় পায়। তাকে ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। এবং এই বৈষম্য ব্যাংক-সেবাকেও সংকুচিত করে। বিশেষ সুবিধাভোগী চক্র তার দখল নেয়। কর্তৃত্ব করে। ওই কর্তৃত্ব বজায় রাখতে প্রতিদ্বন্দ্বী বিনিয়োগকারীদের প্রবেশ ঠেঁকায়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। এবং উৎপাদনের মান পড়ে যায়। এটা শুধু যুক্তির কথা নয়। বাস্তবেও ঘটে এরকম। ব্যাংক, বিনিয়োগকারী ও উৎপাদনকারীর অশুভ

আঁতাত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। যেমন, আমরা দেখি, আমাদের দেশেই গৃহায়ন ও আবাসন উদ্যোগে, দেখি পাইকারি বাজারে অশুভ তৎপরতায়। ব্যাংক এখানে তার দায় এড়াতে পারে না। অথচ তার কারবারের পেছনে থাকে পারস্পরিক আস্থার আশ্বাস। এবং এই আশ্বাসের পেছনে থাকে তাদের প্রত্যেকের উটকো লাভের হাতছানি। কিন্তু আস্থার অন্য মাত্রাও একটা আছে। সেটা, জনসমষ্টির সার্বিক উপকারে তার কারবারও যে কিছু যোগ করে, তার। এই জায়গায় যদি ব্যক্তি-বিশেষের বা গোষ্ঠী-বিশেষের দিকেই কেবল ব্যাংকের সেবা ঝুঁকে থাকে, তবে আপাতদৃষ্টিতে দক্ষতার মাপকাঠিতে উত্রে গেলেও সামাজিক দায়িত্বের বিচারে তা ঘাটতির এমনকি ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের পাকিস্তানি জামানায় প্রকটভাবে তেমনটি ঘটেছিল। পরেও যে এই প্রবণতার সঙ্গে লড়তে হচ্ছে না, তা নয়। বিভিন্ন বিপরীতমুখী তাগিদের সঙ্গে ব্যাংক-ব্যবসাকেও বোঝাপড়া করতে হয়। টাকার তারল্য ও বৃদ্ধির প্রত্যাশার, এবং তার বাস্তবায়নের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারটা-তো আছেই। এই ব্যক্তি ও সমষ্টির আপেক্ষিক উপকার-অপকারের বিষয়টিও উপেক্ষা করা চলে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আপনা থেকে তার সমাধান মিলে যায়, এই বিশ্বাস নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগা কোন কাজের কথা নয়। বাস্তবে তা অধরাই থেকে যায়। পরিণামে মার খায় সামাজিক ন্যায়-বিচার।

সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র একটা পাই আমরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির তত্ত্ব-কাঠামোয়।^{১৩} ব্যক্তি-উদ্যোগকে মদত্ দেবার কোন সুযোগই সেখানে নেই। কেবল সামাজিকভাবে নির্ধারিত উৎপাদন কার্যক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের ও তার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারটা তার মাধ্যমে ঘটে। ব্যক্তির কোন উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ নেই। ভবিষ্যতের অনুমোদিত ভোগ-চাহিদা পূরণে বড় জোর তার জমানো টাকা সে ব্যাংকে রাখতে পারে। সমাজ-অর্থনীতিকে তা প্রভাবিত করে না। লক্ষ্য, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা, যেখানে অর্থ-বিল্ডে অধিকারে বৈষম্য-ও-তার বন্টনে পক্ষপাতিত্ব, বা, তার সম্ভাবনা, কর্মক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ব্যবধানের কোন অসঙ্গত সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারে। পূর্বনির্ধারিত আদর্শ ব্যবস্থা সর্বজন মান্য এক কাম্য বিন্দুতে স্থির থাকলে এই সমাধানসূত্র অগ্রাহ্য করা কঠিন। কিন্তু বাস্তব তাতে সায় দেয় না। জনসংখ্যার চেহারা প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে। তাদের পছন্দ-অপছন্দের চেহারাও এক থাকছেন। ওপর থেকে এখানে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা পূরণের পর তাতে গণ-মানুষের আত্মহের প্রতিফলন যে অনেক সময়েই ঘটে না, তার শোকাবহ পরিচয়ও আমরা পেয়েছি। পরিকল্পিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সঞ্চয় আগে থেকে ঠিক করা। সেই অনুযায়ী পণ্যের দাম নির্ধারণ। সেটা স্থির হয় সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে। ধরে নেওয়া হয়, সংগঠন সবার কথা ভাবে। কাউকে বঞ্চিত করতে চায় না। বাজারের কলকাঠি নেড়ে কেউ অন্যায় লাভের সুযোগ নেবে, যোঁট পাকিয়ে কৃত্রিম দুস্থাপ্যতার সৃষ্টি করবে, এটাও সে

হতে দেয়না। নীতি হিসেবে অবশ্যই সাধু। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে পণ্য-তালিকার আপেক্ষিক মূল্য ঠিক করা নিয়ে। সবার মনোগত অভিপ্রায় পরিমাপের দায়িত্ব নিতে হয় নীতি-নির্ধারকদের। সেটা কি কখনও সম্ভব? জোগান ঠিক করে বাজারে বেঁটে দেওয়া, আর, আশা করা, সবকিছু খাপে খাপে মিলবে। খুব কমই এমন ঘটে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামাল দেবার সুযোগ নেই। কারো এ কারণে ব্যাংক-ঋণ নেবার প্রয়োজনও তাই অবাস্তব। প্রযুক্তি-রূপান্তর ও প্রবৃদ্ধি দুটোই কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের পরিণাম, ঝুঁকি কিন্তু এড়ানো যায় না। তা অনেক ও অনির্দিষ্ট। কিন্তু কেউ তা এককভাবে নেয় না। এই 'একক' বিশেষ ব্যক্তির বা একাধিক ব্যক্তির মিলিত জোট, দুই-ই হতে পারে। নীটফল দাঁড়ায় এই, ব্যাংক বাজারকে চাঙা করায় কোন ভূমিকা রাখেনা। ধস আনাতেও কলকাঠি নাড়ার সুযোগ তার থাকেনা। অব্যবহৃত সম্পদের ভান্ডার যদি যথেষ্ট থাকে, তবে এটা কোন সমস্যা হয়না। উপাদানসমূহের পরিকল্পিত সুব্যবহার ঘটিয়ে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের প্রত্যাশিত ছবিও ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু নতুন প্রযুক্তি, সঞ্চয়, পুঁজি ও উৎপাদনের ঝুঁকি নিতে গেলেই সমস্যা দেখা দেয়। সেখানে স্থবিরতা অর্থনীতিকে গ্রাস করার আশংকা। স্বাধীন ব্যাংক ব্যবস্থায় নিয়ম-কানূনের রক্ষাকবচ মেনে বিনিয়োগের সুযোগ সেখানে প্রবৃদ্ধির পথ খুলে দিতে সহায় হতে পারে। বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটতে দেখা যায়। যদিও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সাম্য-ভাবনায় গুরুত্ব আরোপ যে উচ্চতর ন্যায় প্রতিষ্ঠার আশ্রয়েরই যৌক্তিক ফসল, একথা খারিজ করে দিতে পারিনা।

তাহলে টাকাকে পণ্য করে লাভের ব্যবসায় টাকার চলাচলে যোগান দেওয়া দোষের কিছু নয়। এবং এটা একতরফাও নয়। ঝুঁকির জায়গাটা রীতিমত ভাবায়। অথচ ঝুঁকি নিতে না পারলে টাকা নিয়ে কোন ব্যবসাই বাজারের অনিশ্চয়তায় দাঁড়ায় না। পুঁজি সৃষ্টির সুযোগও তৈরি হয়না। ব্যাংক ঋণ এখানে বড় ভূমিকা রাখে। আবার টাকা মার যাবার আশংকাটাও সেই সংগে থেকে যায়। পরিস্থিতি যদি এমন হয়, ধার নিয়ে বা ধার দিয়ে ব্যাংক তার কথা রাখতে ব্যর্থ হলো, এবং পরিণামে গোটা বাজার অস্থির হয়ে পড়লো, তবে ক্ষতির আশংকা আর শুধু ব্যক্তিগত থাকে না। তা গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে ছড়ায়। এবং তা রীতিমত অন্যায়। দায়ী এখানে মানুষেরই লাগামহীন লোভ। এই লোভের নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংক ব্যবস্থায় সুনীতির চর্চায় প্রাথমিকতা পায়। তা সর্বাংশে সংগত ও অবশ্য পালনীয়।

আগেই বলেছি, ব্যাংকে টাকার তারল্য-ও-তার বৃদ্ধির সম্ভাবনার যে সম্পর্ক, তা পরস্পর বিপরীতমুখী। দুই-এর ভিতরে সামঞ্জস্য বজায় রাখা ব্যাংক-ব্যবসাতে মূল কথা। তবে এখানে ঝোঁকটা যদি শুধু টাকা থেকে টাকা বানাবার ওপরেই পড়ে, তবে ব্যক্তিগত কোন অন্যায় বা ভুলত্রুটি না হলেও টাকার বিনিয়োগে পারস্পরিক আস্থার ও পুঁজি কোথায় সর্বাধিক লাভজনক, তা দেখার প্রবণতা টাকাকে আরো টাকার দিকে ঠেলে। সামাজিক বৈষম্যে তা সৃষ্টি করে, অথবা তার অনুপাত বাড়ায়। একে ন্যায় বলা চলে না। যদিও অর্থনীতিকে সচল রাখায় ও

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা সৃষ্টিতে একে উপেক্ষাও করা যায় না। এই উভয়-সংকটের মুখে পড়ে ব্যাংক-ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের ভাবতে হয়। এটা বিশেষ গুরুত্ব পায়, যেখানে দারিদ্রের সংগে লড়াইটাও একটা সামাজিক দায়িত্ব। পাশাপাশি ক্ষমতার ও সুযোগ-সুবিধার কেন্দ্রীভবন এই লড়াইকে করে আরও তীব্র। এমন কি শিক্ষিত নাগরিক-সমাজেও তার বিষক্রিয়া ছড়ায়। এছাড়া ব্যাংক-এর প্রচলিত বিধিমালার ফাঁক গলিয়েও ঘটে চলতে পারে- এবং বাস্তবে ঘটেও অনেক অনাসৃষ্টি। যে উদ্দেশ্যে ঋণের অনুমোদন পাওয়া, তার একটা খোলস সামনে রেখে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে ঋণের টাকা অধিকতর লাভজনক খাতে প্রবাহিত করে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বেসামাল করে দেবার প্রলোভন, ও, সুযোগ পেলেই তার অপচেষ্টা ব্যাংক-কর্মকাণ্ডে এক সার্বক্ষণিক মাথাব্যথার কারণ। সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা-চক্র ও দেশি-বিদেশি কায়মি স্বার্থ প্রশ্রয় দিলে, তা আয়ত্তের বাইরেও চলে যেতে পারে। অর্থনীতির গোটা কাঠামোতে তার প্রভাব পড়ার আশংকা। অল্পকিছু মানুষের হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন তার অনিবার্য পরিণতি। তাতে সামাজিক ন্যায় ও স্থিতিশীল অগ্রগতি ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হলে অবাক হবার কিছু নেই। এর সঙ্গে যদি যোগ হয় খেলাপি ঋণের কারবার ও অশুভ ফটকাবাজির আঁতাত, তবে ব্যাংক-ব্যবস্থা স্বয়ং এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আমাদের যে, কোন অভিজ্ঞতা নেই তা নয়। বরং তা আমাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখে।

জন রউলস-এর ‘এ থিয়োরি অফ জাস্টিস’^{১৪} কে আমরা এই প্রেক্ষিতে বিবেচনায় আনতে পারি। তাঁর কাছে সব মানুষের সমান অধিকার একটি সমাজে ন্যায় বিচারের প্রথম অলংঘনীয় শর্ত এবং এইটির বাস্তবায়নের প্রয়োজনেই তিনি জুড়ে দেন বৈষম্যের শর্ত: (১) মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে, এবং (২) প্রয়োজনের ভিত্তিতে, যেমন, অনগ্রসর মানুষের জন্যে, দরিদ্রতর মানুষের জন্যে, বিশেষ সুবিধা। দ্বিতীয়টিকে তিনি বলেন ‘ডিফারেন্স প্রিন্সিপল’। প্রকৃতপক্ষে, এতে বিরাজমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যে যে অন্যায় তাকেই সুপরিবলিত উদ্যোগে সংশোধন করতে চাওয়া হয়েছে। সবার জন্যে সমান এ নয়। কিন্তু সমাজে ওই সমতার ন্যায়-আক্ষরিক অর্থে সমতা নয়-প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য।

ব্যাংক জাতীয়করণ নীতিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়। বাজার যেখানে অসাম্যের উপর দাঁড়িয়ে, সেখানে অর্থ-বিলের স্বাভাবিক গতি অর্থ-বিলের দিকেই। তার প্রতিফলন ঘটে ব্যাংকের বিনিয়োগেও। ঋণ পেতে গেলেও আর্থিক সক্ষমতা দরকার। তা নইলে সুদে-আসলে টাকা ফেরত পাবার আস্থার জায়গাটা দুর্বল থেকে যায়। ফলে বিত্তবানরাই ঋণ পায়, ঋণ খাটায় এবং গণ মানুষের প্রয়োজনের দিকে নয়, মুনাফার দিকেই নজর থাকে প্রথম। তাতেও কর্মসৃজন ঘটে। কিন্তু তা ঝুঁকে পড়ে সেই সব পণ্য উৎপাদনে, যাদের কেনার আর্থিক ক্ষমতা প্রত্যাশিত ভোক্তাদের আছে। অর্থাৎ কেনার মত টাকা যাদের আছে, তাদের

কথা ভেবেই উৎপাদন। বাজারের ‘বৈষম্য’ গুণিতক হারে বাড়তে থাকে। সত্য কথা, পূর্ণ-প্রতিযোগিতা বাজারে থাকলে, এমনটি ঘটে না। কিন্তু পূর্ণ-প্রতিযোগিতা একটা মরীচিকা। তার মায়ায় আমরা ভুলে থাকি। বাজার কিন্তু অক্ষমদের দূরে ঠেলে। দূরে ঠেলে ওই বাজারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ব্যাংক-ব্যবস্থাও। তার নিয়ম-কানুনে যদি কোন অসংগতি না থাকে এবং টাকা টাকার কাজ যদি অবাধে করে চলে, তারপরেও।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যাংক-জাতীয়করণের মত চূড়ান্ত ব্যবস্থাও কখনো কখনো বেছে নিতে হয়। তবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ‘রউল্‌স্-এর বৈষম্য-নীতি’ কার্যকর করার নিশ্চয়তাও সেখানে জরুরী। শুধু সব মানুষের সমান গণতান্ত্রিক অধিকারের নামতা পাঠ নয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও লক্ষ্য বিষয়ে সচেতনতা। যে কোনটিতে ঘাটতি অর্ধের অপচয়কে প্রশ্রয় দেয়। দুর্নীতিও মাথা চাড়া দেবার সুযোগ পায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যাংক-জাতীয়করণের মূল উদ্দেশ্যই তাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

‘বৈষম্যের’ এই নীতি, এবং সেই সঙ্গে গোটা সমাজের সার্বিক উত্থানের যৌক্তিক ভিত্তি, কিন্তু তাতে বিনষ্ট হয় না, বাস্তবের ন্যায়ও তাকে উপেক্ষা করতে পারে না। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সব বাণিজ্যিক ব্যাংক-জাতীয়করণের নীতি আমরা গ্রহণ করেছিলাম, কাজিত ফল আশানুরূপ মেলেনি। বস্তুগত ও চেতনগত যে অবকাঠামো প্রয়োজন, তা যথেষ্ট ছিল না। অভ্যাস লালিত ধারায় সুযোগ সুবিধায় লাভবান যারা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ-সন্ধান তৎপর যারা, তাদেরও অসহযোগিতা ছিল। অন্যান্যও এই সব পথে ঢুকে পড়েছিল। খেলাপি ঋণের কু-সংস্কৃতি শিকড় গাড়ার সুযোগ পায়। তা থেকে মুক্তি এখনও মেলেনি। শেষ পর্যন্ত বে-সরকারী ব্যাংককেও দরজা খুলে দিতে হয়। তা যেমন অর্ধের ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রচলনে সাবলীলতা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য, তেমনি আর্থসামাজিক ক্ষমতায় পরিবর্তমান সমীকরণ রাশিকে প্রশমিত করার জন্য। সমাজ তার সঙ্গে আপোষ করেছে। সেটা যদি সামাজিক স্বীকৃতির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হয়ে থাকে তবে বলার কিছু নেই। কিন্তু ন্যায় শুধু বর্তমানেই স্থির থাকে না। তার ভবিষ্যৎ শাখা-প্রশাখা নিয়েও তাকে ভাবতে হয়।

এইখানেই আসে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা ব্যবস্থাপনার গতানুগতিক পথে থেকেও আরো তাকে প্রসারিত ও কোথাও কোথাও তাৎক্ষণিক বিপরীতমুখী করার প্রয়াসের প্রাসঙ্গিক বিবেচনার কথা। জন রউল্‌স্-এর বৈষম্য-নীতিকে এ মান্য করে এবং এর সার্বিক লক্ষ্য অস্ত্যাদয়, সামাজিক উর্ধ্বতন ও উদ্বোধন। আমরা জানতে পারি, ‘..... বাংলাদেশ ব্যাংক তার বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের দারিদ্র নিরসনের জন্যে ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকা দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার কৌশল বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্যে কৃষি,

এসএমই (স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ) সহ উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পরিবেশবান্ধব খাতগুলোতে পর্যাপ্ত ও দৃশ্যমান ঋণের যোগান নিশ্চিত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির পরিধিও বিস্তৃত করা হয়েছে। উপেক্ষিত বর্গাচারীদের জন্যে প্রথমবারের মত ৫০০ কোটি টাকার একটি উদ্ভাবনীমূলক পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী হওয়ায় অর্থনীতির মূলস্রোতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো ও তাদের উদ্যোক্তা হওয়ার অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ‘সুযোগের বাতায়ন’ খুলে দিতে কৃষি ও এসএমই খাতে স্বল্প সুদে নারীদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশের গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছাতে ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ শাখা খোলার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।বলা চলে ... অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির এক শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে’।^{১৫}

এই নীতিমালাকে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলিত লক্ষ্য-বিন্যাস ও কর্মকলার সঙ্গে ঠিক ঠিক মেলানো যায় না। লাভের সম্ভাবনার সাথে ঝুঁকির যে একমুখি সম্পর্ক এবং ঝুঁকির রাশ টেনে ধরে লাভকে সর্বাধিক করাকে প্রাথমিকতা দিয়ে যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তহবিল সাজানোর উদ্যোগ তার সঙ্গে এ সরাসরি খাপ খাবেনা, এমন ধারণাই প্রবল। অথচ লাভের হিসাবটাই ব্যাংক-ব্যবস্থার কার্যকারিতায় ও গতিশীলতায় মূল চালিকা-শক্তি। কোথাও কোন স্ব-বিরোধ কি তবে দেখা দেয়? ব্যাংকের ন্যায় ও সমাজের দাবি কি একে অন্যের সঙ্গে সংগতি হারায়? এ প্রশ্নের মুখোমুখি হবার আগে এটাও অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন, ব্যাংকও একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মালিকানা যেমন হোক, ব্যক্তিগত লাভ যার যত হোক, তার কারবার যদি সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন সাড়া না জাগায়, যদি তার বৈচিত্র্যে ও বিস্তারে কোন হেরফের না ঘটে, তবে তার সফলতার ও বিফলতার স্থিতিপত্রের মূল্যায়ন থেকে, তা যথেষ্ট সন্তোষজনক হলেও, তার দায়িত্ব পালন পুরোপুরি যথাযথ হয়েছে, এমনটি নিশ্চিত করে বলা সহজ হবে না। ব্যাংকের ন্যায় একে গুরুত্ব না দিলে তারও নৈতিক স্বলন ঘটে বলে মানতে হয়।

এটা ঠিক ব্যক্তির লাভ যদি বাড়ে এবং আরো লাভের আশা যদি সামনে থাকে, তবে সে আরো ঝুঁকি নেবার কথা ভাবে, কারবারে বেশি বেশি টাকা ঢালে। তাতে বাজার তেজি হয়। ব্যাংক থেকে ঋণের চাহিদা বাড়ে। উপকার কিন্তু প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে অন্যদের ভিতরেও ছড়ায়। আমাদের পোশাক শিল্পে যেমন, বহু মেয়ের কাজ জোটে, সমাজও তার সঙ্গে তাল মিলাতে বাধ্য হয়। শিল্পে ব্যক্তিগত লাভ ও আরো লাভের প্রত্যাশা নিচুতলাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ জাতীয় উদ্যোগে ব্যাংক-ব্যবসাও উৎসাহ যোগায়। আঁতাত একটা তৈরী হয়, সেই আঁতাত থেকে, শ্রেণী বলবো না, গোষ্ঠীচক্র আকার পেতে থাকে। যদিও বাস্তব পরিস্থিতিতে তার আবশ্যিকতাও মেনে নিতে হয়।

কিন্তু তাতে লভ্যাংশের পুঞ্জীভবন ঘটতে থাকে। বাজারের পণ্য-সরবরাহ ক্রয়ক্ষমতার পেছনে ছোট্টে। তার বন্টন আর সুসম থাকে না। অসম প্রতিযোগিতা যখন অনেককে বাইরে ছিটকে ফেলে তখন তাদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যাংক ব্যবস্থার সাধারণ নিয়মে তারা আর বিবেচনায় আসে না। যদিও কখনো কখনো ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্যেও তাদের মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। স্বল্প ও মাঝারি পুঁজির চাহিদা মেটাবার প্রয়োজনের কথা ওঠে তার পরে। তবে তাদের কাছে ভোগ-চাহিদা ও পুঁজি চাহিদা প্রায় সমার্থক। কারণ শ্রমের কর্মক্ষমতা সৃষ্টি না হলে, পুঁজির ব্যবহার অবাস্তর হয়ে পড়ে।

ব্যাংকের সাধারণ নীতিমালায় এরা তার কর্মকাণ্ডে বিবেচনার আওতায় পড়ে না। এমন কোন সম্পদ এদের নেই, যা বাঁধা দিয়ে এরা ঋণ পেতে পারে। অথচ এর ফলে ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে শুধু যে নেতিবাচক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, ত-ই নয়, তা জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলে। ধনী-গরিবের তফাত প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকে। বাজার সম্পন্ন মানুষের চাহিদার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেহেতু তাদের সংখ্যানুপাত ক্রমহ্রাসমান, তাই বাজারের আয়তনেও সংকোচন দেখা দেয়। তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে স্থবিরতা আনে। ব্যাংক-ব্যবস্থাতেও তার ছাপ দুর্নিরীক্ষ্য থাকার কথা নয়। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় না। বাজার খণ্ডিত হয়ে পড়ায় অর্থনৈতিক ধারায় অগ্রগতির সম্ভাবনার বিচারেও এ যৌক্তিকতা হারায়।

এইখানেই আসে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কৌশলের প্রাসঙ্গিকতা ও তা আশু বাস্তবায়নে প্রায়োগিক পস্থা-পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা। মনে হয় বাংলাদেশ ব্যাংক গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেই তার সার্বিক মুদ্রানীতিতে ঋণদান কৌশলে মৌলিক কিছু সংযোজন চালু করেছে। তা “রউল্‌স্-এর বৈষম্য-নীতিকেও” কার্যকর রূপ দিতে অগ্রসর হয় এবং এ দীর্ঘকালীন সম্ভাবনার বিচারে সার্বিকভাবে প্রবৃদ্ধি-অনুকূলও বটে। কারণ, তৃণমূল পর্যায়ে চাহিদার গতিশীল বিস্তার বাজারকে সতেজ ও সম্প্রসারিত করে, কেন্দ্র ও প্রান্তের সংযোগ-সূত্র বহুমুখী ও অবাধ হবার সুযোগ পায়।

কিন্তু ব্যাংক-এর যে মূল চালিকা শক্তি, তার মুদ্রা-ব্যবসায় মুনাফা সর্বোচ্চকরণ ভাবনা, তার সঙ্গে কি এ সংগতি হারায়? ঋণের নিরাপত্তার ব্যাপারটাও কি নমনীয় হতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলার আশংকা দেখা দেয় না? বাজার যদি বিস্তৃত হয় এবং ঋণের মাধ্যমে দরিদ্রতর জনগণের ব্যয়ক্ষমতা যদি বাড়ে, যদি লাভজনক কাজে টাকা খাটিয়ে অবস্থা ফেরাবার সুযোগ তারা করে নেয়, তবে সুদ-আসলে ব্যাংকের দায়-দেনা শোধ করাও তাদের আয়ত্তের ভেতরে থাকা সম্ভব। ফলে ব্যাংকের মোট মুনাফায় টান পড়ার কথা নয়। আর সামাজিক লাভ-লোকশানের কথা বিবেচনা করলে এতে আপেক্ষিক উপকার তুলনায় বাড়ারই কথা। ব্যাংক-জাতীয়করণের এটা ছিল অন্যতম লক্ষ্য। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, সামাজিক অসচেতনতা

ও অভিজ্ঞতার অভাব তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এতে তার যৌক্তিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না। অবশ্য বস্তুগত অবস্থা অনুকূল না হলে এ কাজে আসে না। আমাদের মধ্যপন্থার দিকে ঝুঁকতে হয়। ঋণের নিরাপত্তার ব্যাপারে মানতেই হয়, এখানে তদারকির ব্যাপারটা বাড়তি গুরুত্ব পায়। এতে ঋণ বন্টন-ব্যয় প্রত্যেকের বেলাতেও বেড়ে যায়, ফলে সুদের হারেও তার উর্ধ্বমুখী প্রভাব পড়ার কথা।^{১৬} কিন্তু তারপরেও অন্য বিকল্প ব্যবস্থার তুলনায় ব্যাংক থেকে ধার নিলে, গ্রাহকের কাছে সুযোগ-ব্যয় যদি কম হয়, তবে ঋণ চাহিদার ও পরিশোধের আগ্রহে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নিয়ে খুব বেশি উদ্ভিগ্ন হবার প্রয়োজন পড়ে বলে মনে হয় না। ঋণের নিরাপত্তাও তুলনায় হ্রাস পাবে, এটা ধরে নেয়া যায় না। মাঠ-পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এই অনুমানকে সমর্থনই করে। ব্যাংকের ন্যায় ও সামাজিক ন্যায় পরস্পর বিরোধী অবস্থানে চলে যায় না, বরং একে অন্যের পরিপূষ্টিতে সহায় হয়। তবে দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতা থাকা চাই। এটা বহু মানুষের সংযোগে, বিশেষ করে যদি বিপরীতমুখী ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক স্বার্থের সংযোগ ঘটাতে চাওয়া হয়, তার পূর্বশর্ত। ব্যাংকের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিস্তার ঘটে। কিন্তু তার মৌলিক লক্ষ্য থেকে কোন বিচ্যুতি ঘটে না। যদিও ওই লক্ষ্যের সংজ্ঞাকে ব্যাপকতর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে হয়। নৈতিকভাবে এর আত্যস্তিকতা কোনক্রমেই খারিজ করা যায় না। তবে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যমানই এখানে প্রাধান্য পায়। এটাও খেয়াল করি সার্বিক ব্যাংকিং কারবারে এই অভিনব সংযোজন এখনও প্রান্তিক পর্যায়েই রয়ে গেছে। তবে এরই অনুসরণে, ব্যাংক নয়, এনজিও-ও নয়, আবার ব্যাংক-ও বটে, এনজিও-ও বটে এমন হাঁসজাবুর যথেষ্ট বিচরণ আন্তর্জাতিক প্রশ্রয় পেলেও জাতীয় অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সমঅধিকার নীতির স্বার্থে যথোচিত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। এবং তা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই।

আমরা তাই বলে গতানুগতিক ভালো-মন্দ বা উচিত-অনুচিতের ধারণাকে খাটো করে দেখছি না। শুধু বলতে চাই, তার চিরাচরিত কোন নীতিমালার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর, স্থানে ও কালে তা আপেক্ষিক। এবং অনেক সময়েই তা ব্যাংকের নিজস্ব এখতিয়ারকে অতিক্রম করে। ব্যাংক-জালিয়াতি, ব্যাংকের টাকা নয়-হয় করে শেয়ার-বাজারে ধস ইত্যাদি অপরাধের বিচ্ছিন্ন বিচার অবশ্য কর্তব্য। বিধিনিষেধের বেড়া জালও যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এসব শর্ত পূরণ হলেও অনেক সময় মূল অপরাধীরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। শুধু তাই নয়, ক্ষমতার প্রভাব-বলয়ে উজ্জ্বল উপগ্রহের মত বিরাজ করে। শুধু ব্যাংক-ব্যবস্থাপনা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন দেশেই না। এর সঙ্গে জড়িত ক্ষমতার সতত ক্রিয়াশীলতা, তার অন্তর্জাল ও বিভিন্ন সংযোগ-রেখার সম্পর্ক-সঙ্গম। সেগুলো নিয়ে কথা বলা আপাতত আমাদের আয়ত্তের বাইরে। এককভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সামগ্রিকভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থা বড়-জোর সতর্ক প্রহরার কাজ করতে পারে। কিন্তু তার মূল ধরে টান দিতে পারে না। তারপরেও ব্যাংক তার নিজস্ব দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। তা ব্যক্তিগত

ও প্রাতিষ্ঠানিক, দুই-ই। মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে তথ্য-সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক জায়গায় দেখা যায়, নিরবলম্ব গ্রামীণ ঋণগ্রহীতার হাজার টাকা পাবার কড়ারে হাতে পায় নয়শ টাকা। এমনটাই কোথাও কোথাও চল হয়ে যায়। সময় ও চাহিদার তাগিদে ঋণ-গ্রহীতার সুযোগ-ব্যয় আরো বেশি। কাজেই তাকে রফা করতে হয় এতেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মহৎ ব্যাপক উদ্যোগ কিন্তু তলা থেকে নড়বড়ে হয়ে যায়। তা প্রশয় পায় অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ তৎপরতা থেকে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানেও। নীটফল দাঁড়ায় এই, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বদলে যাবার, বদলে দেবার মৌলিক প্রণোদনা শুরুতেই হোঁচট খায়। অর্থমূল্যে না হলেও জনগণের প্রত্যাশার মাপকাঠিতে এর গুরুত্ব কম নয়। এটা ধরে নিয়েই আমরা কেবল ব্যাংক-ব্যবস্থা মানুষের কল্যাণের ক্ষেত্র কীভাবে প্রসারিত করতে পারে, কীভাবে তাকে আরো কর্মক্ষম ও উন্নয়নমুখী করতে পারে, কীভাবে অধিকার বঞ্চিত মানুষের সুযোগ ও সৃষ্টিশীলতার সম্ভাবনা বাড়াতে পারে, এগুলো নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে পারি। আর এই কথাটুকু মাথায় রেখে ন্যায়নীতির ধারাবাহিকতায় পথ ও গন্তব্য নিয়ে আমার ভাবনাটুকু শুধু, খাপছাড়া হলেও, আপনাদের সামনে তুলে ধরি, এবং এই তুলে ধরতে পারায় কৃতার্থ বোধ করি। অঙ্কের হাতি-দেখা বলে অনেকের মনে হবে, আমি তাদের কাছে কর জোড়ে মার্জনা ভিক্ষা করি।

টাকা ও নির্দেশিকাঃ

১. Ethics in Banking, Essays in Honour of Nurul Matin, Bangladesh Institute of Bank Management, Dhaka-2011.
২. ঐ, পৃ. ১৭০-২০২.
৩. আমরা দেখি, বিনিময় মাধ্যম ও মূল্য পরিমাপক, টাকার এই দুই সাধারণ ভূমিকা আর সহাবস্থানে-সমবিন্দুতে থাকে না, স্থান ও কালের প্রভাবে টাকার মূল্যের পরিবর্তন ঘটে। এমন কি একই সময়ে বিভিন্ন-মেয়াদের কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন মূল্য নির্দেশ করতে পারে। ব্যাংক-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পেছনে টাকার অন্তর সত্তার এই মূল্য-বিভিন্নতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ন্যায়-অন্যায়ের সরল-পাঠে কোন একক মান, ফলে, অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
৪. N.K Sinha (ed), The History of Bengal (1757-1905), University of Calcutta, 1967, p.19. আরো দেখুন, রজতকান্ত রায়, পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, ইতিহাস গ্রন্থমালা ৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৪৯-১৫৪.
৫. Bangladesh Bank, Annual Report, 2011-2012, p. 229,231.
৬. Professor Nurul Islam, 'Ethics in Banking', BIBM, Dhaka, 2011, p. 134-140.

৭. অমর্ত্য সেন তাঁর Idea of Justice গ্রন্থে (Allen Lane, London, 2009) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, নানা প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর মত করে সমাধানও সাজিয়েছেন। বিতর্কের অবকাশ অবশ্য থেকেই যায়; এবং থাকাটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ।
৮. R.P Kangle, Kautilya's Arthasastra, Univesity of Bombay, Bombay, 1970.
৯. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১/১২/২-৫; মুণ্ডকোপনিষদ, ১/১২/৭-৮; -দেখুন উপনিষৎ গ্রন্থাবলী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮১.
১০. এই দান-ধ্যান ছিল অতীব পুণ্যের কাজ। পরম্পরাগত ন্যায় ভাবনায় বিশেষ সমর্থনযোগ্য, নাটোরের রাণী-ভবানীর বা হুগলির হাজি মুহাম্মদ মহসিনের নিঃস্বার্থ দান ছিল কিংবদন্তি তুল্য। কিন্তু ভবিষ্যতের সমাজ-দ্বন্দ্বিকতাকে- বহুলাংশে সামাজিক অন্যায়ে-অসচেতনভাবে তারা লালন করেছে।
১১. মোঘল বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্ ১৭২৩ সালের এক ফরমানে টাকার ব্যাপারী ফতেহ্ চন্দকে 'জগৎশ্রেষ্ঠ' খেতাব প্রদান করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক রবার্ট অর্ম তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'The greatest banker in the known world'। (উদ্ধৃতি, সুশীল চৌধুরী, 'Merchants, Companies and Rulers, Bengal in the Eighteenth Century, The Journal of the Social History of the Orient, Vol. XXXI, p. 91; আরো দেখুন, রজতকান্ত রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০)
১২. এটা যে সব সময়ে ব্যক্তিগত আড়াল খুঁজে সরল সুবিধার সর্বোচ্চকরণ, শুধুমাত্র তা নয়। সুযোগ-সন্ধান সচেতন নষ্টমিও যোগ হয়। বিশেষ করে আমাদের সাহিত্যে এর প্রতিফলন বারবার চোখে পড়ে। বাংলায় পরশুরামের গড্ডলিকা-য় গণ্ডেরি়াম বাটপারিয়া কোন অবাস্তব চরিত্র নয়।
১৩. L. Ya. Berri (ed), Planning a Socialist Economy, Vol.1, Progress Publishers, Moscow, 1977.
১৪. John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971.
১৫. আতিউর রহমান, 'প্রাক্কথন', বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংক, অগ্রগতির চার বছর (২০০৯-২০১২), ২০১৩, পৃ. ১১-১২.
১৬. Nurul Islam, Thoughts on Microfinance and All That, Pallikarma Sahayak Foundation, 2012.

Ethical Considerations in the Business of Banking
[A Brief and Stray Account of the Summary of the Original
Bengali Version]

It is in many cases an elusive proposition to ascertain conclusively what is good, and, what is not, in human conditions at a given place in a particular point of time. For, those human conditions are continuously changing; and an act of piety or of noble intent may in the end lead to dichotomous or thorny issues to cause more harm than good in the society at large. Individual well-beings also give way to multiple options, fraught with uncertainties, not all of them leading to satisfactory outcomes. To give an emphatic verdict is, therefore, almost impossibility.

Despite this predicament, or, may be, because of this, we probe very seriously into practical happenings and try to work out or analyse the paths of consequences- hypothetical or actual- to thrive for attaining the best possible options for the present to explore the uncertainties in the future in order that we may move on a track for optimal development, even though that optimality remains a subject of continuous dispute. This has a distinct bearing on the study of banking, which, though a very old practice in its primitive form with a static circular flow of production, causing the charge of interest an act of unethical extortion, has assumed a pivotal character in a developing economy where money itself becomes a commodity which facilitates not only exchange of goods and services, but also the expansion of production activities with the spread and transformation of values from the present into the future through the operations of the market. This entails the creation of expectations which are also absorbed in the functioning of money. It is thus characterized by a multiplicity of interests, each ascribing

an impact of its own. Even standardized money as a result, does no more remain unique while its face value at a moment of time does not change. Banking activities, by the very nature of their practices, have to take care of these diverse issues to make the ethical questions relating to them all the more intriguing.

It is to be understood in this context that there is nothing eternal in the attributes of virtue or piety. They are basically related to the time and place of occurrence and are expected to have a spill over into the future, a possibility which in a changing world remains highly problematic. The legendary Rani Bhavani of Natore, for example, gifted away vast blocks of land in the name of God to the people belonging to the superior caste as an act to comply with spiritual obligation. This was in the eighteenth century, even prior to the rule by the East India Company. Natore had under its jurisdiction nearly one-third of the whole of Bengal. Such acts, irrespective of religious denomination and the groups of beneficiaries were widely spread in other parts of the region as well and were considered of great merit and special virtue. But it had an inherent contradiction. The land owners did not till the soil as they were not sanctioned to do so because of their superior caste position or of their aristocratic ruling status in the society. They farmed out their properties to actual cultivators and extracted from them the surplus to live quite comfortably, often luxuriously on that. A cleavage was created in the society; it was even widened with the enactment of the Permanent Settlement in 1793. The consequences have not been to the good of the people. Had there been a common cause made by the cultivators to fight exploitation, the situation could have turned for a better social transformation. But the collective consciousness of the people did not respond that way, and remained rooted on the whole in the old values as dictated in the scriptures, 1500 to 2000 years old, with corresponding vested interests, that might have been suitable for societies, emerging from areas of intellectual darkness. Sectarian ideas based on faiths, as a

consequence, got an opportunity to flourish and led to the tumultuous events of the 20th century. The down-trodden and the under-privileged remained the worst sufferers all over this period, even though spectacular achievements took place.

This has a bearing on our thoughts here, as we are yet to shun off dead woods or wastes of older rituals and habits that run contrary to, or, sometimes cohabiting with modern knowledge, based on the achievements in science and technology and also on the aspirations for growth, accommodating and benefitting every section of people in the society. If the banking institutions show a bias in favour of old beliefs and work in special categories, then however much they are successful, as we examine the balance sheets of their track-records, they encourage people to remain intellectually and morally stunted and also create incoherence in the society. In the context of the present day demands on our thoughts and actions, this can not be called ethically fair.

As we all know, the banks deal in money. The instrument is credit. Deposit accumulation from private beings or social bodies, and, deposit creation through the disbursement of loans from its accumulated account of funds are their basic functions. There is a time-tag attached to each deal. The greater the time-scale, the more is the risk or liability which demands to be compensated accordingly. This is how the rate of interest – multiple values for multiple levels in time and quantity – enters into the game and keeps it in motion. The difference between what the bank earns on the loans it creates and what it gives on deposits it accumulates is its profit. The object of the bank is to maximise it in the given circumstances. So long as it remains transparent and consistent with the laws, as enshrined on the basis of the will of the people, that is reflected in a democratic choice, there is nothing wrong in it. In addition – and this is of critical importance- by way of credit creation, it creates money, which helps expand the operation of the market in the matter of buying and selling of goods and services

which contribute to production and consumption, and also to saving and subsequent capability to invest in the process. This remains at the heart of the operations of a modern economy, and should not be said to hurt any-body's conscience. Interest payments, one way or the other, are prices of risks involved. As a practice, they should not be treated as unfair.

But if a bank, or, a pseudo-bank, like a micro-credit organization, even if of high international repute, takes advantage of market inelasticities as also of existing institutional rigidities, and play on the interest rates to earn supernormal profit at an exorbitant rate, which may attract foreign investors as well to join in, it may not be said to be appropriate or ethical, despite its success creating waves all over the world. Jagat Seth House in the eighteenth century was, on record, recognized as the biggest banker on earth, but it can not absolve them of the mischief, they committed in their conspiratorial role in the battle of Plassey in 1757. Their power and influence was the result of their success as a banker. Banking ethics thus transcends the boundary of market operations for profit only. Even as recent as during the period of Pakistan rule, the banking operations, though on the surface impeccable, were instrumental in draining out the surplus the then East Pakistan peasants earned through their exports and using it to build up the industrial base in West Pakistan. The banking and industrial houses collaborated and joined in the power clique of that state. This can not be called ethically fair, although it was found to comply with all the provisions of the laws then in operation in the land. It could also be defended on grounds of a kind of text-book prescriptions.

However, for banks, to optimize under the prompting of two opposing motivations, liquidity and profitability, is a necessary objective for functioning in a market which is open to future expectations. The actual outcomes, as it happens with any venture under risk and uncertainty, may be different from predictions, but the market conditions demand to be transparent and subject to the

set of regulations which are equally applicable to all the operators in the business. Any underhand deal or illicit practices for personal ends of one or a gang is grossly unfair and should be treated as a criminal act to be dealt with accordingly. This does not come in the purview of right or wrong to be pursued by a bank. Notwithstanding this, the social functionings may at times bring that into the fore. This has to be dealt with on a wider perspective taking many other socio-economic parameters into consideration.

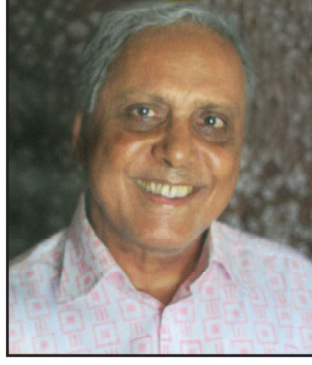
But in this conceptual framework profit is understood as accruing to an individual or a group of individuals forming a company. Social benefit is indirect, and in its calculation of profit, the bank is not obliged to take that into account. Herein comes a problem of delivering 'fair justice' in the process. John Rawls in his book, *A Theory of Justice* (1971) to make feasible the condition of equal rights to every man and woman, introduces his 'difference principle' suggesting that the less advantaged people be given more benefits in order that in the end the distribution of wellbeing among the entire population tends to be equalised. If we take a broader view of profit from this point of view, taking the entire society into consideration, then the relative good to the less privileged ones as a result of policy initiatives is also counted in the determination of the resultant. 'Profit' in the aggregate for the society as a whole is then to have a broader perspective.

Keeping this in view, we look at the new initiatives of the Bangladesh Bank. In order to implement a policy of 'inclusive growth', as spelt out by its Governor, Atiur Rahman, it has given special emphasis on the member banks giving out loans for small and medium scale enterprises to the people belonging to the lower strata in the society, particularly in rural areas with women getting special attention in the arrangement. The share croppers with little means to provide collateral are also brought under the scheme for productive loans with a provision for recycling them for longer term benefits. Apparently these do not maximise 'profit' as we

understand it. But they are surely in the direction of optimizing social benefit, which, no-doubt, contributes to enhancing long term profit in a broad sense of the term. This, to my mind, is an act in the right direction to raise the ethical standard of our banking system.

However, the importance of trust and responsibility in the behavioral pattern of every member in the business can not be softened or wished away. Fairness in policies and actions become meaningful only if they are allowed to operate in a congenial atmosphere with little to worry about relating to these basic habits in the development of social relationships on a macro-level in the population. Any kind of sectarianism stands in the way and frustrates the move towards better ethical conduct in the business of banking. Simultaneously it can not be made to operate without a regulatory authority either. It would be too risky to make it free for all, where resources and opportunities are limited, and allurements are many. The regulatory authority has, therefore, to work as the watch-dog, to see that the evils of imperfect competition are contained and the norms of the forward-looking ethical conduct are maintained; and if possible, improved upon as time brings about inevitable transformations in social relationships. The governments in a democratic set up and the central bank, both have a role to play in this direction.

অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহার জীবনবৃত্তান্ত



সনৎ কুমার সাহা ১৯৪১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এবং পরবর্তীতে লন্ডন স্কুল অব ইকোনোমিক্স হতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে ২০০৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ের মধ্যে ১৯৮৬ সালে তিনি ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স এর ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এ ভিজিটিং ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৩-৯৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন এলিজাবেথ হাউজ এ কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেই সময়ের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা বিভাগে একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাংলা এবং ইংরেজী জার্নাল এবং সাময়িকীতে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, প্রকৃতি এবং অর্থনীতির উপরে অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তিনি ইংরেজীতে দু'টি মনোগ্রাফও রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত অন্যতম গ্রন্থগুলো হলোঃ *সমাজ সংসার কলরব*, *আকাশ পৃথিবী রবীন্দ্রনাথ*, *ভাবনা অর্থনীতির*, *বিশ্বায়ন উন্নয়ন ও অন্যান্য*, *কথায় ও কথার পিঠে*, এই *বাংলায়*, *কবিতা-অকবিতা রবীন্দ্রনাথ* এবং *এলোমেলো হাওয়া*।

জনাব সাহা ২০০৭ সালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির স্বর্ণপদক লাভ করেন। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমী সাদাৎ আলী আকন্দ সাহিত্য পদক ১৯৯৯, প্রথম আলো শ্রেষ্ঠ বই পুরস্কার ২০১২ এবং বাংলা একাডেমী পদক ২০১৩ লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের একজন পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।



বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট
সেকশন - ২, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬

